Prantik Gabeshana Patrika
Multidisciplinary-Multilingual- Peer Reviewed-Bi-Annual
Digital Research Journal
Website : santiniketansahityapath.org.in
Volume-3 Issue-1 July 2024
ISSN 2583-6706 (Online)

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের উপন্যাসে উপনিবেশবাদ

চন্দনকুমার কুণ্ডু

Link : https://santiniketansahityapath.org.in/wp-content/uploads/2024/07/8_chandan-kumar-kundu.pdf

সারসংক্ষেপ: উপনিবেশবাদ সাম্রাজ্যবাদেরই একটি বিশেষ রূপ। উপনিবেশে কেন্দ্র ও উপনিবেশের মধ্যে ফারাক যত্ন করে টিকিয়ে রাখা হয়। আইনের চোখে, শাসকের শোষণের মধ্যেও থাকে অসাম্য, উভয়ের জন্য আইনও আলাদা। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর নানা উপন্যাসে উপনিবেশবাদের এই রূপটিকে বাস্তব করে তুলে ধরেছেন। আইন-আদালতে, শাসনে, বন্যার্তের সেবায়, দুর্ভিক্ষের সাহায্যে এই উপনিবেশবাদ প্রকট।

সূচক শব্দ: উপনিবেশবাদ, শাসন, শোষণ, আইন, শাসক, উনিশশো তিরিশ, গান্ধীজী, প্রফুল্লচন্দ্র, সুভাষচন্দ্র

কোনো একটি রাষ্ট্র যখন নিজেদের স্বার্থে অন্য কোনো একটি ভূ-খণ্ডকে দখল করে নেয় এবং সেই দখল করা ভূ-খণ্ডের মানুষদের উপর নিজের শাসন চাপিয়ে দিয়ে তাদের শোষণ করে নিজের লাভ বাড়ায়, তখন সেই শাসন ব্যবস্থাকে সাম্রাজ্যবাদ (Imperialism) বলা হয়। সাম্রাজ্যবাদ আমাদের ইতিহাসে এক খুবই পুরনো অভিজ্ঞতা, আদৌ নতুন কিছু নয়। উপনিবেশবাদ (Colonialism) এই সাম্রাজ্যবাদেরই একটা বিশেষ রূপ। সাম্রাজ্যবাদীরা নিজেরাই অধিকৃত অঞ্চলে এসে বসবাস করে। সেখানকার মানুষ, সংস্কৃতি, জীবনধারার সঙ্গে মিশে যায়। কিন্তু উপনিবেশবাদের ক্ষেত্রে তেমনটা হয় না। কেন্দ্র এবং উপনিবেশগুলোর মধ্যে ফারাক যত্ন করে টিকিয়ে রাখা হয়। আইনের চোখে বা শাসনের নিয়মের মধ্য দিয়ে, উপনিবেশের মূল কথাই হলো অসাম্য। কেন্দ্রের মানুষজনের জন্য এক আইন আর উপনিবেশের মানুষদের জন্য অন্য।

"পঞ্চদশ শতকের শেষ ভাগ থেকে বিংশ শতাব্দীর মধ্য ভাগ পর্যন্ত সময় উপনিবেশবাদের স্বর্ণ যুগ। এই সময় ইউরোপের কিছু দেশ পৃথিবীর অধিকাংশ ভূ-খণ্ড দখল করে সেখানকার জনগণকে উপনিবেশিক শাসনের আওতায় নিয়ে আসে। ইংল্যান্ড, হল্যান্ড, ফ্রান্স, জার্মানি, পর্তুগাল, স্পেন ইত্যাদি দেশ প্রায় গোটা দুনিয়াটাকেই ভাগ বাটোয়ারা করে নিয়েছিল বলা যায়।"[১]

বাংলা উপন্যাসের জন্মই ইংরেজ উপনিবেশিক ভারতবর্ষে। কাজেই বাংলা উপন্যাসে উপনিবেশবাদ প্রভাব ফেলবে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। বাংলা সাহিত্যে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় (১৯২০-১৯৭০) এর উপন্যাসেও উপনিবেশবাদি চিন্তা ভাবনার প্রকাশ দেখা যায়। তাঁর, 'তিমিরতীর্থ', 'উপনিবেশ', 'শিলালিপি', 'পদসঞ্চার', 'লালমাটি' ইত্যাদি উপন্যাসে উপনিবেশবাদের নানা লক্ষণ চোখে পড়ে।

১৯৪৪এ লেখা 'তিমিরতীর্থ' উপন্যাসের বিষয় রাজনীতি। উপন্যাসে সমকালীন স্বদেশী আন্দোলনের কথা বলেছেন নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়। রাজনীতির সঙ্গে সমকালীন সামাজিক জীবনের পরিচয় তুলে ধরেছেন। বর্তমান বাংলা দেশের বরিশাল জেলার প্রকৃতি ও জীবনযাত্রা আলাদা মাত্রা পেয়েছে এখানে। আড়িয়াল খাঁ নদী, নলসিঁড়ি গঞ্জে স্টিমার ঘাট আরো মাইল দুয়েক গিয়ে ছোট শহর। লেখক স্টিমার ঘাটে কাহিনি শুরু করে স্টিমার ঘাটেই কাহিনি শেষ করেছেন। উপন্যাসে প্রফুল্ল নামের এক যুবক নতুন হেডমাস্টার হয়ে এসেছিল। কিছুদিন পরেই তাকে চলে যেতে হলো। স্বদেশী আন্দোলনের নেতা হওয়াই তাকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। প্রফুল্লকে ওই স্টিমার ঘাটে নিয়ে এসে স্টিমারে তুলে জেলার জেলের উদ্যেশ্যে নিয়ে যায়, এর মধ্যে উপনিবেশবাদের স্পষ্ট দিকটি ধরা পড়ে। একটি অঞ্চলে রাজনৈতিক চেতনার প্রকাশ কীভাবে সম্ভব হলো তার ছবি এঁকেছেন লেখক। উপন্যাসে হেডমাস্টার প্রফুল্ল আসলে এক রাজনৈতিক সংগঠক। স্কুলে জাতীয় পতাকা উত্তোলন, গঞ্জে বিলিতি জিনিস বর্জন, মদ্যপান বিরোধ

প্রচার, জালিয়ানওয়ালাবাগ দিবস পালন উপলক্ষে জনসভা ইত্যাদি আত্মস্বার্থ সর্বস্ব লোকেদের হঠাৎ একটা ঝাঁকুনি দিয়ে যেমন এসেছিলেন তেমনি হঠাৎই চলে গেলেন প্রফুল্ল মাস্টার। কিন্তু সংগ্রাম চলে গেল না, তার অনুরণন চলতেই থাকল।

'উপনিবেশ' ৩য় পর্ব (১৯৪৪-৪৬) উপন্যাসে উপনিবেশবাদের আর এক স্পষ্ট ছবি চোখে পড়ে। বরিশালের দক্ষিণ দিকে সমুদ্রের কাছেই একটি দ্বীপ চর ইসমাইল এখানে মানুষের বসতি খুব বেশি নয়। উপন্যাসের যখন শুরু তখন চর ইসমাইলের জন সংখ্যা হাজার দেড়েক। দশ বছর পর উপন্যাস যখন শেষ হচ্ছে তখন চর ইসমাইল আধুনিক পৃথিবীর কাছে এসেছে। ছোট খাটো শহরের রূপ নিয়েছে। ভদ্রতা, সভ্যতার পালিশ লেগেছে তার গায়ে। স্টিমার কোম্পানি ব্যবসা খুলেছে, স্কুল খুলেছে, সার্কেল অফিসারের হেডকোয়ার্টার আর দাতব্য চিকিৎসালয় চর ইসমাইলকে আধুনিক করে তুলেছে। মাথার উপর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বিমানের ওড়া উড়ি। মজুতদারি, কালো বাজারির দৌলতে চরের জীবনে দুর্ভিক্ষ নেমে এসেছে, আগে মেঘনা, তেতুলিয়ার বন্যার তান্ডবে গ্রাম উজাড় হতো এখন ম্যালেরিয়া একা সেই কাজ করে চলেছে। আর মাঠ ভরা সোনার ফসল ফলিয়েও চাষিদের উপর চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে মন্বন্তর। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কালো ছায়া পড়েছে চরের উপর ফলে এখন মানুষে মানুষে লড়াই। আন্তর্জাতিক সমস্যার ঘন কালো ছায়া চর ইসমাইলের আকাশকে কালো করে ফেলেছে।

'উপনিবেশ' উপন্যাসে দেখি পর্তুগিজদের দুটি পরিবার ও কয়েকটি চরিত্র। ডি সুজা, তার নাত্নি লিসা, লিসার প্রতিবেশী প্রণয়ী যোহান, ডি সিলভা ও তার ছেলে ডি ক্রুজ আর একটি চরিত্র গঞ্জালেস। তাদের রক্তে খেলা করে তিনশ বছরের হারমাদী ঐতিহ্য। — হিংস্রতায়, ক্রূরতায়, বে-আইনি কাজকর্মে। ইংরেজ উপনিবেশে অন্যান্য বিদেশীদের অবস্থাও শোচনীয়। দুর্দান্ত পর্তুগীজদের বিলুপ্ত গির্জাটার খাড়া পড়ির চূর্ণ — বিচূর্ণ বুকের মতো পর্তুগীজ পরিবার গুলির অবস্থা। সেই ডি সুজা, বাঘের মতো দুঃসাহসী মানুষটা উন্মাদ হয়ে গিয়ে আত্মহত্যা করেছে। জোহাণ — বর্মীরা যার গলা কেটে নদীর ধারে ফেলে রেখে গিয়েছিল। আর লিসি যার শোকে পাগল হয়ে গিয়েছিল ডি সুজা। হাকিম মণিমোহন ডাক বাংলোয় ফিরেছেন সকালের হাঁটা শেষ করে। তখন চরের জীবন জেগে উঠেছে। লেখকের চোখে ধরা পড়েছে "লেংটি পরা এবং উলঙ্গ একপাল ছেলে মেয়ে বিহ্বল ভীত চোখে মণিমোহন লক্ষ্য করিতে লাগিল।"[২] এখানেও অসাম্য। উপনিবেশিক মানুষ ও কেন্দ্রীয় শাসকের অধিনে থাকা আধিকারিক, দুয়ের মধ্যে বৈষম্য কত স্পষ্ট।

বলরামের সঙ্গে কথা বার্তায় মণিমোহন অনেক কথা বলেছেন। যেমন উপনিবেশ, বানিজ্য-বিস্তার, আর্থিক একচেটিয়া সুবিধা-বলশেভিক বিনাশ, গণতন্ত্রের প্রসার ও রক্ষা ইত্যাদি, তা বলরাম বুঝতে পারেনি। আমাদের বুঝতে অসুবিধা হয় না যে উপনিবেশিক শক্তির একজন প্রতিনিধি মণিমোহন উপনিবেশিকতার বিষয়টি বোঝাতে চেয়েছেন এখানে। বলরাম এইসব কঠিন বিষয় বুঝতে না পেরে প্রশ্ন করে "কিন্তু যারা যুদ্ধ করছে না তাদের এতো কষ্ট দেওয়া কেন? ভাত নেই, কাপড় নেই।"[৩] মণিমোহন বলেন, তার দরকার আছে। ডাচ দার্শনিক স্টিনমেতস তাঁর 'ফিলসফি অব অয়ার' বইয়ে বলেছেন, "যুদ্ধের সময় অসামরিকদের খুব বেশি করে কষ্ট দাও — খেতে দিও না — শুধু চোখ দুটো রেখে দাও জল ফেলবার জন্য।"[৪] উপনিবেশিক ইংরেজরাও যে এই নীতিরই পক্ষপাতি তা মণিমোহনের কথাতেই স্পষ্ট। এমন চিন্তা ভাবনার পক্ষে তার যুক্তি হলো, যাতে সাধারণ মানুষ মনে করতে পারে যে তাদের এই দুর্গতির জন্য শত্রুরাই দায়ী ফলে শত্রু পক্ষের প্রতি তাদের মন বিদ্বেষ ও হিংসায় আচ্ছন্ন হয়ে উঠবে। আর তা হলেই যুদ্ধজয় অনিবার্য। মামুদপুর থানার অফিসার ইনচার্জ বিপ্লবীদের উদ্দেশ্যে বলেছেন, 'ওগুলো মানুষ নয়, জানোয়ার।' তার বক্তব্যেও কলোনিয়াল মানসিকতার প্রকাশ।

ইংরেজ উপনিবেশে এদেশে বসবাসকারী অন্যান্য বিদেশিদের অবস্থাও ভারতীয়দের থেকে ভালো কিছু ছিল না। বলরামের কথা থেকে জানতে পারি, পর্তুগিজগুলো দুনিয়ার অনাসৃষ্টি জীব। যেমন নাম তেমনি আকার প্রকার আর তেমনি ব্যবহার। মরে মরে প্রায় ফুরিয়ে এসেছে, দু-চার ঘর যা আছে সেগুলি গেলেই আপদের শান্তি। এত কিছুর পরেও উপন্যাসিক আক্ষেপের সুরেই যেন বলেন, "তবুও সূর্য ওঠে, নবজাতক সূর্য। সদ্য জাগ্রত চোখ মেলিয়া তাকায় পৃথিবীর দিকে, তাকায় চর ইসমাইলের দিকে। আর উপনবিশের অর্ধ — পরিণত মৃতস্তরের নিচে আদিম লাভা ফুলিয়া, ফুলিয়া ফুঁসিয়া উঠে।"[৫] বৈষম্য কণ্টকিত, বিরোধ জর্জরিত অলস শান্তির তলা থেকে উত্তাল আগ্নেয় আক্ষেপ যেন অমার্জিত মানুষগুলির শিরা — স্নায়ুতে সাঞ্চারিত করতে চায়। উপনিবেশের বুকে মন্বন্তর, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, উনিশশো বিয়াল্লিশের আত্মাঘাতী বিস্ফোরণ। উপনিবেশের ফলস্বরূপ এ দেশের মানুষের প্রতিক্রিয়াকে দেখাতে ভোলেন নি লেখক। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় উপন্যাসের শেষ দিকে রাজনীতি

এনেছেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, বাংলার দুর্ভিক্ষ, আগস্ট আন্দোলনও আছে। সামাজিক রাজনৈতিক বিষয়কে মূল বিষয় বলে তাঁর উপন্যাসে গুরুত্ব দিয়েছেন। 'উপনিবেশ' উপন্যাসে মূল ভূ-খণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন চর ইসমাইলে রাজনীতি ছিল না। লেখক কাহিনিতে রাজনীতি নিয়ে এসেছেন। উপনিবেশের রাজনীতিকে স্পষ্ট করে তুলেছেন। শ্রমজীবী মানুষের গণ আন্দোলন যে মুক্তির পথ, সে পথের দিশাও দিয়েছেন তিনি।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর 'শিলালিপি' (১৯৪৯) উপন্যাসে কয়েক বছর আগেকার স্বাধীনতা আন্দোলনের কথা বলেছেন। গান্ধীজীর নেতৃত্বে অহিংস অসহযোগ আন্দোলন রঞ্জনের ভালো লাগেনি। যদিও পিকেটিং ও গণ জাগরনের রূপটিকে নায়ক পরম আগ্রহে লক্ষ্য করেছেন। রঞ্জনের কৈশোর বয়েস থেকে যুবক বয়েস কাহিনির বিস্তার। ক্রমে সে বিপ্লবী দলের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়ে। উপন্যাসে একটি বালক ক্রমে বড় হচ্ছে, জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে এগোচ্ছে তার বিশ্বাস্য ছবি এঁকেছেন লেখক। রঞ্জনের চোখ দিয়েই ঘটনাকে দেখিয়েছেন তিনি। উপন্যাসে বারে বারে ঘুরে ফিরে এসেছে উনিশশো তিরিশ সাল, তার বন্যা তার রাজনৈতিক আন্দোলন।

তিরিশ সালে উত্তর বঙ্গের বন্যায় বন্যার্ত মানুষকে উদ্ধার করতে গিয়ে জলে ডুবে মারা যান সত্যাগ্রহী অবিনাশবাবু। এই বন্যায় "রেল লাইন ডুবে ছিল, বহু গ্রাম ভেসে গিয়েছিল, মানুষ, গরু, ছাগল প্রাণ দিয়েছিল অজস্র।"[৬] এই বন্যার সেবার কাজে সমস্ত বাংলাদেশ সাড়া দিয়েছিল। ছুটে এসেছিলেন আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র, ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন সুভাষচন্দ্র বসু। কিন্তু উপনিবেশবাদী ইংরেজ সরকারের পক্ষ থেকে বন্যার্তদের সাহায্যের কোনো তৎপরতা চোখে পড়ে না। কলোনি থেকে তাঁরা শুধু নিয়েছেন, দেননি কিছুই। বিপদের দিনে সামান্য সাহায্যও নয়। অসাম্য কলোনিয়ালিজমের অন্যতম লক্ষণ তা যেন প্রকট হতে দেখা যায় এখানে। শিক্ষা ক্ষেত্রেও এই অসাম্য চোখে পড়ে। "'না ঠেঙালে ছেলে বয়ে যাবে'— এই মহান মূল মন্ত্রটি কোন ইংরেজ শিক্ষক কবে আবিস্কার করে অমরত্ব লাভ করেছেন কে জানে।"[৭] রঞ্জুর স্মৃতিতে পাড়াগাঁয়ের এম.ই. স্কুলে শাস্তি দানের রীতি-নীতি ও উপনিবেশিক শক্তির মতোই। কারা শাস্তি পাবে কারা পাবে না এই ভেদের মধ্যেও ছিল উপনিবেশিক মানসিকতারই প্রতিফলন। ধনঞ্জয় পণ্ডিতের মৃত্যুর পর তাঁর স্ত্রীকে মহাজন যজ্ঞনাথ কুণ্ডুর বাড়িতে রাঁধুনির কাজ নিতে হয়। এখানেও উপনিবেশিক ব্যবস্থাকেই আমাদের সামনে স্পষ্ট করে দেয়।

স্কুলে নিশিকান্তকে শাস্তি দিতে ক্লাস ওয়ান থেকে সিক্স পর্যন্ত ছেলেদের দিয়ে নিশিকান্তের কান মলে দেওয়ার নির্দেশ দেন হেড মাস্টার মশাই। রঞ্জুর সময় এলে সে নিশিকান্তের চোখে অস্বাভিক কিছু দেখেছে। 'সে চোখ মানুষের নয়।' রঞ্জুর চেতনায় ধরা পড়েছে সে ছবি, "এ অপমান মানুষের অপমানের প্রথম উজ্জ্বল প্রতিচ্ছবি। অভাব আর দারিদ্রের সঙ্গে লড়াই করে যারা প্রত্যেক দিন পৃথিবীতে হার মেনে যাচ্ছে, তাদের সেই পরাজয়কে নিষ্ঠুর নির্মম অপমান। নিশিকান্ত একক নয়, বিচ্ছিন্ন নয় নিশিকান্ত। তার চোখে আরও অনেকের কথা — আরও অনেক পরাজিত মানুষের অসহায় অপমানের একটা রক্তাক্ত প্রতিবাদ।"[৮]

আঠারো বছর সুনাম আর সুখ্যাতির সঙ্গে চাকরি করার পর রঞ্জুর বাবা, থানার অফিসার ইনচার্জ-এর চাকরি চলে গেছে। আর সন্ধ্যার পরই রঞ্জুর বাবা যত বিলিতি কাপড়, পুলিশি ইউনিফর্ম, একগাদা টুপি, দু-তিন খানা রাজভক্তির সার্টিফিকেট পুড়িয়ে ফেলেছেন। অনেক পাপ একসঙ্গে পুড়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। এ সবের প্রতিক্রিয়া স্বরূপ বিদেশি বয়কট, মাদক বর্জন, লবণকে অস্বীকার শুরু হলো। গান্ধীজী সাম্রাজ্যবাদের নির্লজ্জ স্পর্ধার উত্তরে বললেন, 'মেরা এক কদম সে সারে হিন্দস্তান উথাল পাথাল হো যায় গা' হিন্দুস্থান উথাল পাথাল হয়ে উঠল, ঘরে ঘরে ত্রিবর্ণ পতাকা উড়ল, চরকার ঘড় ঘড় শুরু হলো, মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় দেবতার প্রসাদী ফুলের মতো হাসি মুখে মাথায় তুলে নেওয়ার আহ্বান এলো। রাস্তার মোড়ে বিলিতি কাপড়ের স্তুপ পুড়তে লাগলো। ছেলেরা বেরিয়ে এলো স্কুল, কলেজ থেকে। মোক্তাররা বেরিয়ে এলো আদালতের মোহ কাটিয়ে। ভয় নেই, সংশয় নেই। স্বাধীনতা হীনতায় কেও বেঁচে থাকতে চায় না। স্কুলে পিকেটিং হয়েছে। পুলিশ লাঠি চালিয়েছে, অ্যারেস্ট করেছে। কিন্তু সেদিনের উদ্দামকে দমাতে পারে নি।

'লালমাটি' (১৯৫২) উপন্যাসে সচেতন ভাবে সরাসরি রাজনীতিকে এনেছেন উপন্যাসিক। এ উপন্যাস স্বাধীনতার কয়েকবছর পরে লেখা হলেও এর কাহিনি স্বাধীনতাপূর্ব বাংলার নির্দিষ্ট একটি অঞ্চলের জন-জীবন। আর সে জনজীবন বরেন্দ্রভূমির। উপন্যাসে রাজনৈতিক ঘটনা ধারার মধ্যে রঞ্জন চরিত্রকে পাই কম্যুনিস্ট পার্টির সংগঠক হিসাবে। কাহিনির সূচনা

লগ্নেই রঞ্জনের দেখা মেলে এভাবে, "মেঠো পথ দিয়ে যেতে যেতে সকৌতুহলে সেখানে সাইকেলটা থামাল রঞ্জন — কর্মী রঞ্জন চট্টোপাধ্যায়। আগ্রহ-ভরে জানতে চাইলো কি রে, কি শিকার পেলি তোরা?"[৯] আত্মপরিচয় গোপন করে, গীতা পাঠ করে শোনাবার কাজ নিয়ে জমিদার বাড়িতে থাকার জায়গা করে নেয় রঞ্জন। সে সাঁওতাল ও আহিরদের ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে।

মার্ক্সবাদী সাহিত্যিক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় স্বাধীনতা পূর্ব রাজনৈতিক সমস্যাকে উপন্যাসে উপস্থিত করেছেন। স্বাধীনতা পূর্ব কলোনিয়াল ভারতের রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে মার্ক্সবাদীর দৃষ্টিতে দেখেছেন লেখক। মুসলিম লিগের পৃষ্ঠপোষক শাহ এবং ভৈরবনারায়ণ তারা দু'জন দু'জনের শত্রু। কিন্তু এই দুই জমিদার প্রজা বিদ্রোহ দমনে এক। শাহ মুসলিম লিগের আন্যতম নেতা। আর ভৈরব ইংরেজ ভক্ত জমিদার। উপন্যাসে শাহ্ ও ভৈরবনারায়ণের কথোপকথনে তার প্রমাণ পাওয়া যায়, "চাপা তীক্ষ্ণস্বরে শাহ্ বললেন, ব্যাস খতম! — না, খতম নয় — ভৈরবনারায়ণ বললেন, এই শুরু,... আপনি তৈরি হোন শাহ্, আমিও তৈরি। গ্রামকে গ্রাম জ্বালিয়ে দেব — দুটোই না হলে দুশোর মাথা নামিয়ে দেব মাটিতে।"[১০] কলোনিয়াল ভারতে জমিদারদের ইংরেজ ভক্তি এবং প্রজা শোষণ কলোনিয়ালিজমেরই প্রতিচ্ছবি।

মুসলিম লিগের পাকিস্তান দাবিকে সংখ্যালঘুর রক্ষাকবচ বলে মনে করতো কম্যুনিস্টরা। লিগের আঞ্চলিক নেতৃত্ব ছিল শাহর মতো আত্যাচারি জমিদারের হাতে। ইসমাইলের মতো দাঙ্গাবাজ লিগের নেতা। সাঁওতালদের কালীর থান ঘেঁসে এরা রাতারাতি মসজিদ তৈরি করে দাঙ্গা শুরু করে। তবুও রঞ্জনদের মতো কম্যুনিস্টরা মনে করে সংখ্যালঘুদের বিকাশের জন্য পাকিস্তান হওয়া উচিত। নীলকর সাহেবদের এক বংশধরের পারিবারিক সমস্যাও উঠে এসেছে উপন্যাসে। বরেন্দ্রভূমির রাঙামাটির বুকে মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার নিপুন আলেখ্য 'লালমাটি' উপন্যাস, যার মধ্যে উপনিবেশবাদের প্রকাশ দেখা যায় ।

আমরা জানি, বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে বিশেষত ব্রিটিশ উপনিবেশগুলোয় জাতীয়তাবাদী আন্দোলন প্রবল হয়ে ওঠে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে মিত্রশক্তি জয়লাভ করলেও ইউরোপের উপনিবেশিক দেশগুলির প্রচুর ক্ষয় ক্ষতি হয়। উপনিবেশ রক্ষা করা আর লাভজনক থাকে না। একই সঙ্গে ক্রামাগত গণ আন্দোলন উপনিবেশগুলিকে স্বাধীনতা দিতে বাধ্য করে। কিন্তু সমাজ তাত্ত্বিকদের মত হলো, স্বাধীনতা প্রাপ্তি মানেই উপনিবেশিক ইতিহাসের সমাপ্তি নয়। উপনিবেশবাদ পৃথিবীর উপর যে গভীর ছাপ ফেলেছিল তার প্রবহমান রূপ এখনো সমান ভাবে সচল; বর্তমান সমাজে, সাহিত্যে, রাজনিতীতে, আইন-আদালতে বিরাজমান। একথা আমাদের স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, "Colonisation is generally (Mis) taken mostly as a political process,..."[১১]

তথ্যসূত্র:

১। 'বুদ্ধিজীবির নোটবই', সুধীর চক্রবর্তী সম্পাদিত, পুস্তক বিপণি, কলকাতা ৭০০০০৯, প্রথম প্রকাশ জুন ২০০৫, পৃ. ১২১-১২২
২। 'উপনিবেশ', 'নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রচনাবলী', মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ষষ্ঠ মুদ্রণ ১৪২৮, পৃ. ১০৩
৩। ওই, পৃ. ১০৮
৫। ওই, পৃ. ১২৩
৬। শিলালিপি', 'নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রচনাবলী', মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ষষ্ঠ মুদ্রণ ১৪২৮, পৃ. ২৬৩
৭। ওই, পৃ. ২৭৩
৮। ওই, পৃ. ২৭৭
৯। 'লালমাটি', নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, অঞ্জলি প্রকাশনী, প্রথম সংস্করণ ১৯৯৮, পৃ. ৮-৯
১০। ওই, পৃ. ১৮০-১৮১
১১। 'Contemporary Literary Theory A Student's Companion', N. Krishnaswamy, John Varghese, Sunita Mishra, MacMillian India Ltd.2001, p. 90

লেখক পরিচিতি: চন্দনকুমার কুণ্ডু, অধ্যাপক, অভেদানন্দ মহাবিদ্যালয়, সাঁইথিয়া, পশ্চিমবঙ্গ